ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1507-1513
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.157

প্রয়াণ শতবর্ষে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির অবিসংবাদি নেতা ‘দেশবন্ধু’ চিত্তরঞ্জন দাশ

বিশ্বজিৎ খাঁন, *সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বহরমপুর কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

June 16, 1925, marks an irreparable loss in the politics of communal harmony in Bengal. It was a turning point in Hindu-Muslim political relations in Bengal. On this day, we lost a beloved and revered leader of all communities in Bengal—Hindus and Muslims alike—a true friend of the nation, Deshbandhu Chittaranjan Das. The year 2025 marks the centenary of Deshbandhu Chittaranjan Das's death, which has been commemorated with great solemnity. At a time of deep communal crisis in Bengal and across India, Chittaranjan Das emerged as a beacon of communal harmony. In just eight years of active political life, he secured a place in the hearts of Bengalis for his religious tolerance. Through this tolerance, he deeply understood the Hindu-Muslim issue in the politics of the Indian subcontinent. Among his political contributions, the most significant was the formulation of the Hindu-Muslim Agreement, known as the Bengal Pact, aimed at establishing and preserving harmony between the Hindu and Muslim communities in British-ruled Bengal. The Bengal Pact remains a remarkable example of Chittaranjan's religious tolerance and secularism. This article discusses Deshbandhu Chittaranjan Das's ideals, thoughts, and strategies regarding communal harmony. It explores how his religious liberalism made him a deeply trusted political figure among Bengal's Muslim community. The article also delves into how communal separatism began and developed in contemporary Bengal's politics, and how Deshbandhu Chittaranjan Das strived to resist it. Through this article, we attempt to pay humble tribute to Deshbandhu by remembering his ideals, vision, and approach to communal unity.

Keyword: Communalism, Communal harmony, Riot, Bengal Pact, Khilafat, Separatism

তুমি গেলে;
তবু তুমি রয়ে গেলে মানুষের মাঝে-
যতদিন রবে এ দেশ, এ ভাষা, এ আশা,
রবে তব প্রতিচ্ছবি তাদের প্রাণে।

জীবনানন্দ দাশ

জন্মিলে মরিতে হয়, মানুষ অমর নয়। নশ্বর মানব সমাজে এমন দুই একজন আসেন যাদের মৃত্যুর পরেও পরবর্তী যুগের মানুষ তাদের কথা মনে রাখে। নিজ কীর্তিতে তাঁরা অমর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এদেরই একজন।[১] বাংলার এই বিখ্যাত দেশপ্রেমিক, বিখ্যাত ব্যারিস্টার, দেশের বন্ধু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ২০ ই কার্তিক, ১২৭৭ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর) কলকাতার পটলডাঙ্গা স্ট্রিটে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগের প্রসিদ্ধ

যদুনন্দন বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক ধর্মীয় উদারতার পরিবেশ তাঁর মনে ধর্মীয় সহনশীলতা ও উদারতার জন্ম দিয়েছিল। বাংলা তথা ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের এক সংকট জনক পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোক বর্তিকা নিয়ে বাংলা তথা দেশের রাজনীতিতে আবির্ভূত হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

> "ভারতবর্ষের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না।"[২]

আজীবন তিনি বাংলার হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। হিন্দু মুসলিম ধর্ম পরিচয়, নির্বিশেষে বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখায় তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল।

> "জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্ম সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে।"[৩]

এহেন হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক তদেবক্য ও সম্প্রীতির পূজারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এবার প্রয়াণ শতবার্ষিকী (মৃত্যু- ১৬ ই জুন, ১৯২৫) পালিত হল সাড়ম্বরে। এই প্রবন্ধে আমরা দেশবন্ধুর সাম্প্রদায়িক তদেবক্যের আদর্শ, চিন্তাধারা, কর্মপন্থা স্মরণ করে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনের চেষ্টা করব।

ভারতবর্ষে আধুনিক রাজনীতির পরিনাম হিসেবেই সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ঘটেছে।[৪] ভারতের প্রথম সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হয় ১৮৮০ র দশকে।[৫] আরও পরে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, সমাবেশের রাজনীতি, জনমত সৃষ্টি ও সংগঠিত করার ধারার আবির্ভাব মতাদর্শ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ঘটায়। ১৯৩৬ সালে জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন,

> "কখনোই ভুললে চলবেনা ভারতের সাম্প্রদায়িকতা পরবর্তীকালের ঘটনা আমাদের চোখের সামনেই তা বড় হয়েছে।" [৬]

ইংরেজদের 'বিভাজন ও শাসন' নীতি সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করে। আর কিছুটা করেছে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কিছু স্বার্থান্বেষী ধর্মান্ধ ব্যক্তি। এমন কিছু মহৎপ্রাণ মানুষও ছিলেন যাঁরা তাদের অজ্ঞাতসারে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নানা কারণে নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ধর্মীয় চেতনা রূপান্তরিত হয় সাম্প্রদায়িক চেতনায় এবং সাম্প্রদায়িক চেতনার উত্তোরণ ঘটে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্যে।

মুসলিম সম্প্রদায় প্রাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ না করায় বাংলা সহ সমগ্র ভারতের সমস্ত প্রকার সরকারি ও বেসরকারি চাকরি, শিক্ষা, আইন, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অসম প্রতিযোগিতায় মুসলিমরা যত পিছিয়ে পড়ল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধানের পাঁচিল তত দৃঢ় হতে শুরু করে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মুসলিমরা তাদের স্বার্থ বিরোধী বলে মনে করতো। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ ঘোষণা করেন, কংগ্রেস হিন্দুদের সংগঠন এবং তার প্রধান লক্ষ্য গুলো মুসলমান স্বার্থের বিরোধী।[৭] বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন যেভাবে পরিচালিত হয়েছিল তার ফলেও হিন্দু মুসলিম বিচ্ছিন্নবাদ আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। নতুন প্রদেশ মানেই আরও বেশি চাকরি, সুযোগ-সুবিধা ইংরেজদের এই প্রচার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলিমদের স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী করে তুলেছিল। পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯০৬-০৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ, নন্দাইল, জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ, শেরপুর, ফুলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম ভয়ংকর দাঙ্গা সংগঠিত হয়।[৮]

১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে ভারতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন নীতি চালু হয়। এখানে মুসলমানদের জন্য পৃথক সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি ঘোষিত হয়। এতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রত্যুত্তরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভব ঘটে। ১৯০৯ সালে পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু সভা। এর অনুকরণে বিহার, যুক্ত প্রদেশেও হিন্দু সভা গঠিত হয়। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় সারা ভারত হিন্দু

মহাসভা। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মধ্যে কিছু সদর্থক পরিবর্তন ঘটেছিল, যার ফলে উভয় দলই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নরম মনোভাব নিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ১৯১৬ সালে স্বাক্ষর করে লক্ষনৌ চুক্তি। এই চুক্তি সাময়িকভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্তেজনা রোধে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতায় সাম্প্রদায়িকতা আবার মাথা ছাড়া দিল কুৎসিৎভাবে। মুসলিম লীগ আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো, হিন্দু মহাসভাকেও পুনরুজ্জীবিত করা হলো। আর এই পটভূমিকাতেই বাংলা তথা দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় আবির্ভাব ঘটল হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একনিষ্ঠ পূজারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনের সভাপতি রুপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রকাশ্য সক্রিয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন, শুরু হয় তাঁর বর্ণময়, কর্তৃত্ববাদী ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের রাজনৈতিক জীবন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে তিনি বলে ছিলেন,

> "হিন্দু মুসলমানগন লইয়াই বাঙ্গালী জাতি। সুদৃঢ় রূপে এই সমগ্র বাঙ্গালী জাতি একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতীয়তার গৌরবে মণ্ডিত হইয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইবে; তাহাই আমাদের লক্ষ্য।"[৯]

চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মানতেন না। তিনি সব সময় মনে করতেন, "মানুষ- মানুষই; ব্রাহ্মণ হলেও সে মানুষ নমঃশূদ্র হলেও সে মানুষ।'' মনুষত্বের অমর্যাদাতে তিনি ব্যথিত হতেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' চন্ডীদাসের এই অমর বাণী তার মর্মে মর্মে গাঁথা ছিল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তাই তাঁর একেবারেই ছিল না, তা সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, উচ্চ হোক বা নীচ হোক, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক কিছু এসে যেত না তাতে; তাঁর কাছে সকলেই ছিল মানুষ, সেই মানুষেরই বিকশিত রূপ দেখেছিলাম তাঁর মধ্যে।[১০]

তিনি মনে করতেন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ইংরেজদের বিভেদ নীতির ফলে তৈরি হয়েছে। এই বিভেদ নীতিই এই দেশে ইংরেজ শক্তিকে স্থায়ীত্ব দান করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আসাম প্রাদেশিক খিলাফৎ সভার সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন,

> "হিন্দুর সহিত মুসলমানের জাতিগত বিরোধ মুসলমান আমলে ছিল না। টোডরমল, বীরবল, যশবন্ত সিংহ, মান সিংহ মুসলমান সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। এখন হায়দ্রাবাদ যেখানে হিন্দু প্রজা বেশি, রাজা মুসলমান; আবার কাশ্মীরে মুসলমান প্রজা বেশি, হিন্দু রাজা; সেখানে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নাই। বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল বৃটিশ শাসনে। কিন্তু আজ ভারত মাতার দুটি সন্তান হিন্দু মুসলমান বুঝিয়াছে যে উভয়েরই স্বার্থ এক – বিদেশীর স্বার্থ উভয়কে বিচ্ছিন্ন রাখা।"[১১]

তিনি সবসময় সচেষ্ট ছিলেন ইংরেজদের এই বিভেদকারী শক্তির বিরুদ্ধে বাংলা সহ ভারতের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে বিদেশীর কূট চক্রান্তকে পরাজিত করতে। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্য ও অনৈক্য দূর করার জন্য সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা তিনি বলেছেন। তিনি মনে করতেন,

> "আমাদের ধর্মগত, জাতিগত ও স্বার্থগত বৈষম্য ও অনৈক্য দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই একমাত্র উপায়।"[১২]

১৯১৭ সালে বরিশালের এক বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ বর্ণনা করে বলেছিলেন,

> "ইহা হিন্দুদিগের স্বায়ত্তশাসন হইবে না, মুসলমানদিগের স্বায়ত্বশাসন হইবে না, জমিদারের স্বায়ত্বশাসন হইবে না, ইহা হইবে সমগ্র বাঙ্গালার প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসন, ইহাতে সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হইবে। যতদিন না এইরূপ স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয় যাহাতে বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক সমাজের সকল স্বার্থ সমান ভাবে রক্ষিত হইবে, ততদিন বাঙ্গালাদেশে শান্তি থাকিবে না।"[১৩]

১৯১৯ সালের জনবিরোধী রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর, বর্বর হত্যাকান্ড, পাঞ্জাবের সামরিক আইন প্রভৃতি নানা কারণে সাধারণ মানুষের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। তার উপর ১৯১৯ সালের শেষ দিকে ঘোষিত মন্টেগু- চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব এবং পাঞ্জাবের গন্ডগোল নিয়ে লোক দেখানো

হান্টার কমিটি নিয়োগ ভারতীয়দের ক্রুদ্ধ করে তোলে। এর মধ্যেই আলী ভ্রাতৃদ্বয়- মহম্মদ আলী ও সৌকত আলির নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তুরস্কের সুলতান অর্থাৎ খলিফার মর্যাদার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইতিমধ্যে গান্ধীজি ধীরে ধীরে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন।তিনি খিলাফৎ নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগযোগ রেখে চলছিলেন। ১৯১৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে গান্ধীজি বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দিলেন। ১৯২০ সালের মে মাসে ইংরেজরা তুরস্কের সঙ্গে সেভর্স –এর চুক্তি স্বাক্ষর করলে ভারতীয় মুসলমানদের আশা ভঙ্গ হল। গান্ধীজি খিলাফৎ কমিটির কাছে প্রস্তাব দিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে অসহযোগিতার কর্মসূচি গ্রহণের। ১৯২০ সালের ৯ জুন এলাহাবাদে খিলাফৎ কমিটি সর্বসম্মত ভাবে অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং গান্ধীজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালো।[১৪] গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করলে ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুরু হল হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের যৌথ তদেবক্যবদ্ধ আন্দোলন খিলাফৎ- অসহযোগ।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাস গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়েছিলেন। কিন্তু ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে তিনি বুঝলেন অসহযোগ আন্দোলন ছাড়া দেশের অবস্থার উন্নতির ভিন্ন কোন উপায় নেই। সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন অসহযোগ- খিলাফৎ আন্দোলনে। তিনি তাঁর আইন ব্যবসা ছেড়ে বাংলার নানা প্রান্তে অহিংস অসহযোগের নীতি কর্মপন্থা প্রচার করা শুরু করেন। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, করটিয়া, বরিশাল প্রভৃতি সভায় মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করে চিত্তরঞ্জন হিন্দু- মুসলিম দরিদ্র প্রজা কৃষকদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দেন।

> "তাহার সে সব বক্তৃতায় সুপ্ত বঙ্গদেশ জাগ্রত হইল। ভগীরথ যেমন স্বর্গ হইতে মন্দাকিনীর পূণ্য ধারা মর্ত্যে প্রবাহিত করিয়া মৃত সগর বংশকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ছিলেন, তেমনই চিত্তরঞ্জন তাহার আন্তরিক স্বদেশ প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় বাঙ্গালার প্রাণশূন্য অকর্ম্মণ্য দেহে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিলেন।"[১৫]

অতঃপর ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর ভারত সরকারের আমন্ত্রণে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত ভ্রমণে মুম্বাই শহরে পৌঁছলে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির আদেশে মুম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি শহরে হরতাল পালিত হয়। হরতালকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার পরিস্থিতি দেখা যায়। বাঙালায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এই সময় চিত্তরঞ্জন দাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় খিলাফৎ কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে যৌথভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২১ সালের ২৮ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটির এক অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়,

> "গভর্মেন্টের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য খিলাফৎ কমিটি বিবেচনা করিতেছেন যে, এই কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের উপর কমিটির সকল ক্ষমতা অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। অন্য কোন নতুন নির্দ্ধারণ না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষমতার ব্যবহার করিবেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহাদয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি যে কার্য পদ্ধতি স্থির করিবেন তাহাই বঙ্গীয় খিলাফৎ কমিটির সিদ্ধান্ত সম্মত বলিয়া গৃহীত হইবে। এক) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দুই) মৌলানা আব্দুল রউফ তিন) মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও চার) মৌলভী মুজিবর রহমান।"[১৬]

এই ঘটনা প্রমাণ করে বাংলার মুসলিম জনমানষে দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তা, সার্ব্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। এই সময়

> "সমগ্র বঙ্গদেশের প্রধান হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে দেশের এই সংকট সংকুল সময়ে দেশের রাজনৈতিক কার্যনির্বাহের একমাত্র পরিচালক বলিয়া স্বীকার করিলেন। দেশবাসীর বিশ্বাস ও আশা ভরসার গৌরব মুকুট ইতি পূর্বে আর কাহার ও ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া

শোনা যায় নাই। প্রাচীন রোমের বীরত্ব গৌরবের দিনে সিনসিনেটাস ও কোরায়োলেনাস দেশবাসীর নিকট এমনভাবে সম্মান পাইয়াছিলেন ইতিহাসে ইহা জানিতে পারি।"[১৭]

যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরিচৌরায় ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ উত্তেজিত জনতা থানা আক্রমণ করে ২২ জন পুলিশ কর্মীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলে গান্ধীজি অহিংস আন্দোলন সহিংস হওয়ার অজুহাতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবোধ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কংগ্রেস পরিবর্তন বিরোধী ও পরিবর্তনপন্থী এই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। পরিবর্তনপন্থী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে মিলে কংগ্রেস খেলাফত স্বরাজ্য দল গঠন করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১০১ টির মধ্যে ৪৫টি এবং বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় ৮৫ টির মধ্যে ৪৭ টি আসন লাভ করে, যার মধ্যে ২১ টি ছিল মুসলিম আসন। মুসলমানদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক তাকে এই সাফল্য এনে দিয়েছিল। আর এর পেছনে ছিল ১৯২৩ সালের তদেবতিহাসিক হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির চুক্তি বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি। এটাই ছিল দেশবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অবদান। তিনি বুঝেছিলেন সর্বভারতীয় হিন্দু মুসলমানের হিসাব অর্থাৎ হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি, মুসলমানরা সংখ্যায় অল্প, বাংলায় চলবে না কারণ বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগুরু এবং আর্থ সামাজিক ভাবে পিছিয়ে। তাদের সঙ্গে সৎ, সযত্ন বোঝা পড়ায় না আসতে পারলে হিন্দু মুসলমান রাজনৈতিক শত্রু হয়ে উঠবে, বাংলার জন্য সেই ফল হবে ভয়ংকর। দেশবন্ধুর মৃত্যুর ২২ বছর পর ১৯৪৭ সালেই সেই ভয়াবহতা আমরা টের পাই।[১৮]

স্যার আব্দুর রহিম, মৌলভী আব্দুল করিম, মৌলভী মুজিবুর রহমান, মাওলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বস, জে এম দাশগুপ্ত ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে তদেবতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট এর চুক্তিনামা রচনা করেন এবং দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে অনুমোদন করিয়ে নেন।[১৯] এই চুক্তিনামার শর্ত গুলি ছিল-

ক) বঙ্গীয় আইন সভার প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

খ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ।

গ) সরকারি দফতরে মুসলিমদের জন্য শতকরা ৫৪ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা চাকরিক্ষেত্রে এই পর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্য থেকে শতকরা ৮০ জনকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।

ঘ) কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে কোনো আইন পাশ করতে হলে সেই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তিন চতুর্থাংশ বা ৭৫ শতাংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।

ঙ) মসজিদের সামনে বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না। খাদ্যের জন্য গরু জবাই নিয়ে আইন সভায় কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া যাবে না। আইন সভার বাইরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আনার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। গরু জবাই করার সময় যাতে তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে পড়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধর্মীয় কারণে গরু জবাইয়ের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

চ) এসব নীতিমালা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তার জন্য একটি কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটির অর্ধেক সদস্য থাকবেন মুসলিম এবং বাকি অর্ধেক সদস্য থাকবেন হিন্দু।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোকনাদ কংগ্রেসের অধিবেশনে হিন্দু মুসলমান চুক্তি বেঙ্গল প্যাক্ট এর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। প্যাক্ট এর বিরুদ্ধে অনেকে চিৎকার করে বলে ওঠেন বেঙ্গল প্যাক্ট মুছে ফেল, "delete the Bengal pact, delete the Bengal pact."[২০] দেশবন্ধু এখানে হিন্দু মুসলিম চুক্তি সম্বন্ধে বলেছিলেন,

> "Swaraj was impossible without non – violent, non – co-operation and non – co-operation could not be effective without unity between Hindus and Mohamedans. They must therefore work for the unity if they meant to achieve Swaraj."[২১]

কোকনাদ কংগ্রেসে বেঙ্গল প্যাক্ট নিয়ে সিদ্ধান্ত হল যে ভারতীয় প্যাক্ট কমিটি সব প্রদেশের মতামত নিয়ে তাদের প্যাক্ট বিচার বিবেচনা করবেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনের জন্য কংগ্রেস প্যাক্ট নীতিতে দৃঢ় মনোভাব নেয় নি, নিলে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরই সাম্প্রদায়িক সমস্যার এত বাড়বো বাড়ন্ত হত না। কারণ হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় স্বরাজ্য পার্টির মাধ্যমে বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রকাশ্য সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্ট গ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস **১৯২৪** সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করেন। মৌলানা আকরম খাঁ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু সিরাজগঞ্জের আঞ্জুমনি মুসলিম নেতারা তদেবতিহ্যগতভাবেই কংগ্রেস বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দু কংগ্রেস নেতারা প্যাক্টের বিরোধিতা করে সিরাজগঞ্জ সম্মেলন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছিল।[২২] বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপুল জনসমাগমে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে দেশবন্ধুর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা, সভাপতি আকরম খাঁ সাহেবের সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ ও অন্যান্য বক্তাদের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলিম তদেবক্যের বাণী এমন সজীবতা লাভ করেছিল যে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে গৃহীত হয়। দেশবন্ধু তার বক্তৃতায় বলেছিলেন হিন্দুরা যদি উদারতার দ্বারা মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে তবে হিন্দু মুসলিম তদেবক্য আসবে না। হিন্দু মুসলিম তদেবক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থাকিয়া যাইবে।[২৩]

১৯২৫ সালের **১৬** জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি নিজস্ব দক্ষতায় বাংলাদেশে বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা ও মূর্খামীর কারণে বেঙ্গল প্যাক্ট তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যার্থ হয়। কারণ কংগ্রেস সারা ভারতে একরকম আর বাংলায় আরেকরকম নিয়ম মানতে প্রস্তত ছিল না এই মূর্খামির মূল্য দেশবাসিকে চোকাতে হয়েছিল দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে।অন্যদিকে **১৯২৫** সালের শেষ দিকে মুসলিম লীগের আলীগড় বৈঠকের সভাপতির ভাষণে আব্দুর রহিম হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিন্দা করে ভাষণ দেন, এতে হিন্দু নেতাদের অনেকে চটে যান এবং সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বেড়ে যায়। রাজরাজেশ্বরী মিছিলের বাজনা নিয়ে কলকাতায় বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, এতে প্রায় **১১০০** লোক হতাহত হয়।[২৪] হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এর পরের ইতিহাস শুধুই বিভেদের ইতিহাস। এই তিক্ত আবহাওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় চিত্তরঞ্জন হীন কংগ্রেসের দায়-দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। মুসলিম সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব কমে এসেছিল আবার শুধু হিন্দুদের পক্ষে কথা বলায়ও তাদের আপত্তি ছিল। ফলে তাদের হিন্দু-মুসলিম তদেবক্যের কথা কার্যত অর্থহীন দার্শনিক আপ্ত বাক্যে পর্যবসিত হয়েছিল। এই সময় জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ হিন্দু মুসলিম তদেবক্যের বিষয়ে বাস্তববাদী ভূমিকা নিয়েছিল।[২৫] **১৯২৭** সালের নেহেরু রিপোর্টে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন সূত্র উপস্থাপিত হয়েছিল। অতঃপর **১৯২৮** সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনের কিছুদিন আগে বাংলার হিন্দু মুসলিম নেতারা 'দি মুসলমান' অফিসে বেঙ্গল প্যাক্টের বিষয়ে একটি আলোচনা সভা করেন। সভায় হিন্দুদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধান রায়, ললিত চন্দ্র দাস, নলিনী রঞ্জন সরকার প্রমূখ। মুসলিমদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শেখ আব্দুর রহিম, ফজলুল হক, মাওলানা আজাদ, মাওলানা আব্দুল করি, মৌলানা আব্দুল কাশে, মৌলভী মুজিবুর রহমা, মাওলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা ইসলামাবাদী প্রমুখ। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। **১৯২৯** সালে সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মেলনে দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হয়। আর সেই সঙ্গেই শেষ হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার সদর্থক প্রচেষ্টার।

তথ্যসূত্র:

১) বসু, কালিপদ। আমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কলকাতা পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট **১৯৬২**, পৃ: **১**।
২) চৌধুরী, হেনা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ। আলফা বিটা পাবলিকেশনস, কলকাতা, **১৯৬১**, পৃ: ৮।
৩) বসু, সুভাষচন্দ্র। তরুণের স্বপ্ন। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, নবম সংস্করণ- **১৩৬২** বঙ্গাব্দ, পৃ: **১৩**।

৪) চন্দ্র, বিপান। মুখার্জী, মৃদুলা। মুখার্জি, আদিত্য। পানিকর, কে. এন. ও মহাজন, সুচেতা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ: ৩২০।
৫) তদেব, পৃ: ৩৩১।
৬) তদেব, পৃ: ৩২০।
৭) তদেব, পৃ: ৩৩২।
৮) দাস, সুরঞ্জন। বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯০৫-১৯৪৭। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০২৩, পৃ: ৫৩-৫৪।
৯) দেবী, অপর্ণা। মানুষ চিত্তরঞ্জন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ- ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৬৫।
১০) তদেব, পৃ: ১৮৪।
১১) দাসগুপ্ত, সুকুমার রঞ্জন। চিত্তরঞ্জন। ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১২০-১২১।
১২) তদেব, পৃ: ৯৭।
১৩) তদেব, পৃ: ৯৮।
১৪) চন্দ্র, বিপান। মুখার্জী, মৃদুলা। মুখার্জি, আদিত্য। পানিকর, কে. এন. ও মহাজন, সুচেতা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ: ১৪১।
১৫) বসু, সত্যেন্দ্র কুমার। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৮৩।
১৬) তদেব, পৃ: ৯৭।
১৭) তদেব, পৃ: ৯৮।
১৮) দে, অনিকেত। যেখানে দেখেছো বেদনা। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ জুন ২০২৫।
১৯) আহমদ, আবুল মনসুর। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ: ৩৪।
২০) দেবী, অপর্ণা। মানুষ চিত্তরঞ্জন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ- ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২৮৪।
২১) তদেব, পৃ: ২৮৫।
২২) আহমদ, আবুল মনসুর। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১৩, পৃ: ৩৫।
২৩) তদেব, পৃ: ৩৯-৪০।
২৪) তদেব, পৃ: ৪১।
২৫) তদেব, পৃ: ৪২।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) চন্দ্র, বিপান। অমলেশ ত্রিপাঠী। দে, বরুন। স্বাধীনতা সংগ্রাম। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১৩
২) চন্দ্র, বিপান। আধুনিক ভারত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, অক্টোবর, ২০১৩
৩) ত্রিপাঠী, অমলেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭) । আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।
৪) বন্দোপাধ্যায়, শেখর। পলাশী থেকে পার্টিশন। অরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, ২০১২
৫) সরকার সুমিত, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৪
৬) গুহ রায়, সিদ্ধার্থ। চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৬৪। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ার, ২০০৮
৭) মল্লিক, সমর কুমার। আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮ - ১৯৪৭) । ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট, ২০০৮-২০০৯